ভূমিকা

বাংলা স্নাতকোত্তর স্তরের প্রথম সেমেস্টারের PGBNG-CC-1-4 পত্র— 'আধুনিক কাব্য-কবিতা'-এর মডিউল-১-এর পঠিত বিষয়— 'মেঘনাদবধ কাব্য' (সমগ্র)— মধুসূদন দত্ত।

ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার্থে নির্মিত বর্তমান সহায়ক আলোচনার উদ্দেশ্য— কবি মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্য' সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান। 'মেঘনাদবধ কাব্য' কবি মধুসূদনের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। বঙ্গদেশের উনিশ শতকীয় নবজাগরণের কালে কবি এই সাহিত্যিক মহাকাব্যটি রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। এই কাব্য রচনায় তিনি যেমন মহাকবি বাল্মীকির রামায়ণ থেকে বিষয়বস্তু সংগ্রহ করেছিলেন, এদেশীয় কবিদের কাব্যপ্রকরণ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, তেমনই পাশ্চাত্যের বিভিন্ন কবির কাব্যাদর্শ দ্বারাও অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। নতুন যুগের নতুন মহাকাব্য রচনার সচেতন অভিপ্রায়ে এই কাব্যে শব্দ প্রয়োগে, ভাষা গঠনে, ছন্দশৈলীতে, অলংকার প্রয়োগে কবি অভিনবত্বের সঞ্চার ঘটিয়েছিলেন। বিশাল বিষয়কে সংক্ষিপ্ত প্রেক্ষিতে ধরতে গিয়ে কখনো-কখনো গঠনশৈলীতে এসেছে শৈথিল্যও। মহাকাব্য রচনার সতর্ক প্রবর্তনায় কখনো-কখনো ভাব ও ভাষার ক্ষেত্রে কৃত্রিমতার ছোঁয়াও লেগেছে। সব মিলিয়ে 'মেঘনাদবধ কাব্য' রচনা করে কবি মধুসূদন দত্ত সমকালে ও পরবর্তীকালেও একদিকে যেমন প্রবলভাবে সমালোচিত হয়েছেন, তেমনই অন্যদিকে সমালোচকদের দ্বারা প্রশংসিতও হয়েছিলেন। বর্তমান আলোচনায় সেরকমই নিন্দা-প্রশংসার দিক থেকে পরবর্তীকালের দুইজন বিশিষ্ট সমালোচক বুদ্ধদেব বসু ও মোহিতলাল মজুমদার তাঁদের সমালোচনার দৃষ্টিতে কীভাবে স্রষ্টা মধুসূদন দত্ত ও তাঁর অমর সৃষ্টি 'মেঘনাদবধ কাব্য'কে পর্যালোচনা করেছেন সেই বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

এই বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য বুদ্ধদেব বসুর 'সাহিত্যচর্চা', মোহিতলাল মজুমদারের 'কবিশ্রী মধুসূদন', উজ্জ্বলকুমার মজুমদার সম্পাদিত 'মেঘনাদবধ কাব্য চর্চা', কৃষ্ণগোপাল রায় সম্পাদিত 'মধুসূদন দত্তের মেঘনাদবধ কাব্য' ইত্যাদি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

— ড. মানস কবি
সহযোগী অধ্যাপক,
বাংলা বিভাগ
ও
বারসার,
আশুতোষ কলেজ।

আধুনিক বাংলা কাব্য

'মেঘনাদবধ কাব্য'

সমালোচক বুদ্ধদেব বসু ও মোহিতলাল মজুমদারের মন্তব্যের প্রেক্ষিতে বিচার

উনিশ শতকীয় বাংলাদেশে নবজাগরণের কালে বাংলা কাব্য-ক্ষেত্রে বিদ্রোহী প্রাণবন্যার ভগীরথ মাইকেল মধুসূদন দত্তের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি 'মেঘনাদবধ কাব্য' (১৮৬১ খ্রি)। নবজাগৃতির পরবর্তীকালে রচিত এই কাব্যকে কবি গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন সার্থক মহাকাব্য রূপে আর এক্ষেত্রে মধুকবির আশ্রয় হল বাল্মীকি রামায়ণ। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মহাকাব্য রচনায় ব্রতী হয়ে কবি একদিকে পাশ্চাত্যের মহাকবি হোমারের মানবধর্মে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন – মিল্টন, ভার্জিল, দান্তে, ট্যাসোর কাব্যাদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন, তেমনি অন্যদিকে প্রাচীন ভারতীয় কবিদের কাব্য-প্রকরণের মাধুর্য – ঐতিহ্য-পরায়ণতার দ্বারাও বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। এই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবধারার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বাংলাদেশের লোকায়ত সংস্কৃতিও। মহাকাব্য রচনার সচেতন অভিপ্রায় এই কাব্যের শব্দ প্রয়োগে, ভাষাগঠনে, ছন্দশৈলীতে এবং অলংকার প্রয়োগে ঘনত্বের সৃষ্টি করেছে। ভাষা-ছন্দ-অলংকারের মধ্যে যে গাম্ভীর্য রক্ষিত হয়েছে তার সূত্রে রয়েছে সমন্বয়। বিশাল বিষয়কে বিরাট প্রেক্ষাপটে তুলে ধরতে গিয়ে এর ফলে কখনো-কখনো ঘঠন শৈলীতে দেখা দিয়েছে শৈথিল্য – আর মহাকাব্য রচনার সচেতন প্রবর্তনায় কখনো-কখনো ভাব ও ভাষায় মিশেছে কৃত্রিমতার স্পর্শও। কিন্তু তা ব্যাপক ও বৃহৎ মাত্রায় কখনোই নয়। এই সব মিলিয়ে 'মেঘনাদবধ কাব্য' ও কাব্যস্রষ্টা কবি মধুসূদন সমালোচিত হয়েছেন প্রবলভাবে – আবার একই সঙ্গে প্রশংসার দ্বারা সমাদৃতও হয়েছেন কখনও কোনো বিশিষ্ট সমালোচকের প্রজ্ঞা-দীপ্ত মরমী বিশ্লেষণে। এই নিন্দা-প্রশংসার দিক থেকে তাই পরবর্তীকালের বাংলা সাহিত্যের দু'জন বিশিষ্ট সমালোচক কবি মধুসূদনের মূল্যায়ন করেছেন। বিশিষ্ট কবি ও সমালোচক বুদ্ধদেব বসু সমালোচনা প্রসঙ্গে মধুসূদনকে এক্ষেত্রে সম্বোধন করেছেন 'মাইকেল' আখ্যায় আবার বিপরীত পক্ষে বিশিষ্ট কবি-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদারের বিশ্লেষণে-সম্বোধনে মধুসূদন আখ্যাত হয়েছেন 'কবিশ্রী মধুসূদন'-রূপে। মধু-কবি সম্পর্কে প্রযুক্ত দুটি সম্বোধন থেকেই কবির সম্পর্কে সুধী-সমালোচকদ্বয়ের মানসিকতা–দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের দিকটি প্রতিভাত হয়। নিম্নে কবি মধুসূদন প্রসঙ্গে কবি বুদ্ধদেব বসু ও কবি মোহিতলালের এইরূপ মূল্যায়নের কারণগুলি পর্যালোচনা করে দেখা যেতে পারে।

প্রথমে বুদ্ধদেব বসুর মন্তব্যটির বিচার করা হল। স্বনামধন্য কবি মধুসূদনের হাতে কেবল বাংলা ছন্দেরই যুগান্তর ঘটেনি, কবি-ভাষার ও যুগান্তর ঘটেছে। প্রতিভাবান কবি আপন কাব্যের উপযোগী ভাষার সন্ধান না পেয়ে সৃষ্টির ক্ষেত্রে কোনো অন্তরায় বোধ করেননি, বরং কাব্যের সঙ্গে সঙ্গে এক নতুন ভাষাকেও তৈরি করে নেওয়ার তাগিদে তাঁর সৃজনী প্রতিভা নবতর উৎসাহে উল্লসিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু এর বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ উঠেছে পরবর্তী সময়ে। প্রাজ্ঞ সমালোচক বুদ্ধদেব বসু এ প্রসঙ্গে তাঁর 'সাহিত্যচর্চা' গ্রন্থের 'মাইকেল' নামক প্রবন্ধে মন্তব্য করেছেন –

> ''মৃত শব্দরাজিতে আকীর্ণ বলেই মাইকেলি কলরোল আমাদের কানেই শুধু পৌঁছায়, কানের ভিতর দিয়া মরমে পশে না.... মাইকেলের সযত্ন বর্ণিত সব ঘটনা তাইতো সহস্রাক্ষ ছাপার অক্ষরে কেবল মুখের দিকেই তাকিয়ে রইল, কোনো একটি বাসা বাঁধতে পারলো না মনের মধ্যে।''

এমনকি রবীন্দ্রনাথও এই কাব্যের ভাষা সম্পর্কে খুব সুবিচার করেননি। এক্ষেত্রে বুদ্ধদেব বসুর মতোই আরও অনেক সমালোচক 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র ভাষার তীব্র সমালোচনা করেছেন। তাঁদের অভিযোগগুলি সংক্ষেপে সূত্রাকারে নিম্নে উল্লেখ করা হল –

(i) কাব্যে অপ্রচলিত আভিধানিক শব্দের প্রয়োগ-বাহুল্য।

(ii) ব্যবহৃত শব্দরাজি শ্রুতিমধুর নয় – বরং শ্রুতিকটু শব্দের সংকলন।

(iii) কাব্য মধ্যে বাক্য-গঠনে সজীবতার অভাব।

(iv) সংযুক্ত ব্যঞ্জন-সমন্বিত শব্দের অতিশয় প্রয়োগ।

(v) কাব্যে ব্যবহৃত উপমাদি স্বতঃস্ফূর্ত নয় – অনেকাংশেই তা যেন আরোপিত।

(vi) পংক্তির মধ্যে বা বাক্যের ক্ষেত্রে সাধু-চলিতের অসম মিশ্রণ।

(vii) ক্রিয়াপদ গঠনের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচারিতা ও নামধাতুজ ক্রিয়ার অতিমাত্রায় ব্যবহার।

(viii) স্থানে-অস্থানে কাব্য-মধ্যে প্রচলিত ব্যাকরণের লঙ্ঘন।

এইসব বিভিন্ন প্রায়োগিক বা ব্যবহারিক শৈলীগত দিকগুলি ছাড়াও সমালোচক বুদ্ধদেব বসু মনে করেছেন – এই কাব্যটি পাশ্চাত্য ভাবধারায় অনুপ্রাণিত। ভারতীয় ঐতিহ্যের যথাযথ সংমিশ্রন এই কাব্যে নেই। বিভিন্ন বিদেশী কাব্য থেকে উপাদান-উপকরণ সম্ভার গঠন করে আহৃত ভাব ও শব্দ প্রয়োগের ঘনঘটা-কৃত্রিমতা ও বস্তুনিষ্ঠতার অভাবও বুদ্ধদেব বসু লক্ষ করেছিলেন এক্ষেত্রে। তাই তিনি বলেছেন 'মাইকেলি কলরোল' শ্রবণেন্দ্রিয়কে আঘাত করলেও অন্তরে প্রবেশ করে না।

প্রকৃতপক্ষে মধুসূদন চেয়েছিলেন সচেতনভাবেই প্রথাকে - গতানুগতিকতাকে পরিহার করে নতুন পথের অনুসন্ধান। মধুসূদন সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসুর মন্তব্য যে সর্বাংশে সত্য নয় তা নিশ্চিত করে বলা যায়, কারণ কবি এই কাব্যের উপাদান তথা কাহিনি গ্রহণ করেছেন 'রামায়ণ' থেকে; এই কাব্যের মধ্যেই প্রথম আদি-মধ্য-অন্ত্য সমন্বিত একটি আখ্যানের আস্বাদ পাওয়া যায়; চরিত্র পরিকল্পনায় পাশ্চাত্যানুসরণ থাকলেও তার অবলম্বন হয়েছে মানবের চিরন্তন ভাবরাজিই। প্রমীলা এখানে একই সঙ্গে বীরাঙ্গনা ও গৃহবধূ রূপে কল্পিত, আর সর্বোপরি সাধারণ পাঠকের ভাব-দুর্বলতায় আঘাত দিয়ে রামের পরিবর্তে রাবণ চরিত্রের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন। এসবই কবি মধুসূদনের মৌলিকত্বের পরিচয়বাহী।

উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে কাব্য রচনায় ব্রতী মধুসূদন দত্তের এই মৌলিকতার প্রতি লক্ষ করেই পরবর্তীকালের বিশিষ্ট কবি-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার তাঁকে সম্বোধিত করেছেন 'কবি শ্রীমধুসূদন' – এই সম্ভ্রম সূচক সম্ভাষণে। তিনি মনে করেছেন কবি মধুসূদন মৌমাছির ন্যায় বিভিন্ন কাব্য-কুসুম থেকে উপাদান মধু সংগ্রহ করেছেন – কাব্যের প্রথম সর্গে মধুকবির কথায় –

''তুমিও আইস, দেবী, তুমি মধুকরী।
কল্পনা! কবির চিত্ত-ফুলবন-মধু
লয়ে, রচ মধুচক্র, গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।''

আসলে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত হলেও স্বদেশী ভাষার প্রতি মধুসূদন সবসময়ই উচ্চভাব পোষণ করতেন। তাঁর মাতৃভাষা সংক্রান্ত কবিতাগুলি পড়লেই তা বোঝা যায়। 'মেঘনাদবধ কাব্য' রচনার অন্তরালে সক্রিয় ছিল কবির সচেতন মন ও সজ্ঞান অভিপ্রায়। এই কাব্যে কবি শুধু শব্দ সংযোজনের ক্ষেত্রেই বিশিষ্টতা প্রদর্শন করেননি আরও অনেক ক্ষেত্রে তাঁর বিশিষ্টতা লক্ষ করবার মতো। প্রথমে শব্দ-সংকলন–শব্দ-চয়ন ও শব্দ-যোজনের বিষয়টি দেখা যাক –

''বন্দীসম শিলাবন্ধে বান্ধিয়া সিন্ধুরে,
হে সুন্দরী প্রভু মম, রবি-কুল রবি,
লক্ষ লক্ষ বীরসহ আইলা এ পুরে।''

– এর ধ্বনিসামঞ্জস্য ও ধ্বনি ঝংকার পাঠকের মনকেও হিল্লোলিত করে।

এছাড়া সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার কবি মধুসূদনের কাব্যভাষায় কয়েকটি বিশেষ লক্ষণের কথা উল্লেখ করেছেন। সেগুলি নিম্নে সূত্রাকারে তুলে ধরা হল –

(i) কাব্যের মধ্যে সংগীতগুণ সৃষ্টি কবি মধুসূদনের মৌলিকতার পরিচায়ক। ছন্দ ও শব্দের মেলবন্ধনে – স্বরধ্বনির অনুপ্রাস সৃষ্টিতে গীতিময়তার আবেশ কাব্যে ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্রই, যেমন –

''সশঙ্ক লঙ্কেশ শূর স্মরিলা শঙ্করে।''

(ii) নতুন শব্দ সৃষ্টি করার প্রতিভা ও কবির মধ্যে লক্ষ করা যায় – শব্দের ব্যঞ্জনাশক্তির বৃদ্ধির মাধ্যমে খাঁটি বাংলা শব্দের অর্থকে ত্যাগ করে ব্যুৎপত্তিগত অর্থে প্রসারণ করার দিকটিও লক্ষ করা যায়। যেমন – 'অপূর্ব' শব্দটি কবির কাছে হয়ে উঠেছে 'অ-পূর্ব' অর্থাৎ 'অতীত' এই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

(iii) মধুসূদন কাব্যভাষায় ধ্রুপদী গরিমা সৃষ্টি করেছেন। ওজঃ গুণের বৃদ্ধির মাধ্যমে কাব্যভাষার মধ্যে আভিজাত্যকেও ফুটিয়ে তুলেছেন কবি। ক্ল্যাসিক্যাল ধারার মিতব্যয়ী – গাঢ়বন্ধ রূপের প্রকাশে – শালীনতা ও সংযমের সংহতিতে মধুকবি বাংলা ভাষাকে গ্রাম্যতা থেকে মুক্তি দিয়েছেন।

(iv) শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে মধুসূদন কোনো সংকীর্ণতাকে প্রশ্রয় দেননি – সংস্কৃত শব্দের পাশাপাশি প্রাকৃত-নিত্য ব্যবহার্য শব্দের প্রয়োগও করেছেন অনায়াসেই।

(v) মধুসূদন শব্দের ধ্বনিগত সুষমার প্রতি সচেতন ছিলেন – তাই সমুদ্র, শোভাযাত্রা, নগর বর্ণনার মতো বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনার অমিত্রাক্ষর ছন্দের গাম্ভীর্যকে পূর্ণমাত্রায় রক্ষা করেছেন।

(vi) কবির কাব্যে শব্দ প্রয়োগের অনায়াস নৈপুণ্যও লক্ষণীয়। এখানে একটি শব্দ অনায়াসে আরেকটি শব্দকে যেন ডেকে এনেছে। যেমন –

''মূঢ় দক্ষ দোষে যবে দেহ ছাড়ি সতী
হিমাদ্রির গৃহে জন্ম গ্রহিলা আপনি।''

এসব ছাড়াও নামধাতুজ ক্রিয়া ব্যবহারের বৈচিত্র্যে, অলংকার প্রয়োগের দক্ষতায় কবি বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারকে শ্রীমণ্ডিত করে তুলেছেন আপন প্রতিভার মহিমায়। তাই মোহিতলাল মজুমদার যথার্থই মন্তব্য করেছেন –

> ''মেঘনাদবধ কাব্যে'র ভাষা আর কোনরূপ হইতে পারিত না, – ওই রূপ যে হইয়াছে, তাহাও বাংলা ভাষার শক্তি ও সম্ভাবনার প্রমাণ। মধুসূদন তাঁহার কল্পনার অনুযায়ী শব্দচয়নে কেবলমাত্র অভিধানের শরণাপন্ন হন নাই, সেই শব্দরাশির উপরে তিনি নিজের অসামান্য কবিশক্তি প্রয়োগ করিয়া, কাব্যেরই প্রয়োজনে, একটি বিশিষ্ট বাণীরূপের সৃষ্টি করিয়াছেন; তাহাতে ভাষার শক্তিই বাড়িয়াছে – স্বভাবের বিকৃতি ঘটে নাই।'' ['কবি শ্রীমধুসূদন']

সুতরাং, উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে তাই সবদিক বিচার করে একথা বলা যায় যে সমালোচক বুদ্ধদেব বসু মধুকবিকে 'মাইকেল' বলে অভিহিত করে তাঁর যে সমালোচনা করেছেন তা আংশিকতা-দোষে দুষ্ট – এক্ষেত্রে তিনি কবির প্রতি সুবিচার করেননি। কিন্তু সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার তাঁর কবিদৃষ্টিতে কবি মধুসূদন ও তাঁর কাব্যের যে সৎ মূল্যায়ন করেছেন তা তাঁকে 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র শ্রেষ্ঠ সমালোচক রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে।